গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭০ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৯ - ১৫ মার্চ ২০১৮ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

মহান কার্ল মার্কস স্মরণে

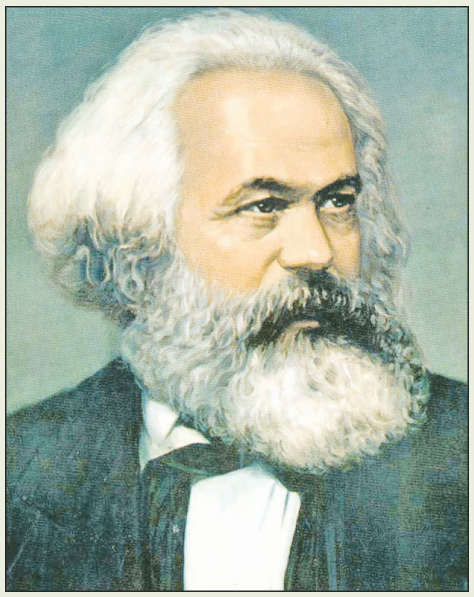

জন্ম ঃ ৫ মে ১৮১৮ মৃত্যু ঃ ১৪ মার্চ ১৮৮৩

"আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত। অথচ আপনাদের বর্তমান সমাজে জনসমষ্টির শতকরা নব্বই জনের ক্ষেত্রেই তো ব্যক্তিগত মালিকানা ইতিমধ্যেই লোপ করা হয়েছে। অল্প কয়েকজনের ক্ষেত্রে সেটা আছে শুধু ওই দশ ভাগের নয় ভাগ লোকের হাতে নেই বলে। সুতরাং যে ধরনের মালিকানা বহাল থাকার অপরিহার্য শর্ত সমাজের বিপুল সংখ্যাধিক মানুষের কোনও সম্পত্তি না থাকা, সেই মালিকী ব্যবস্থা আমরা তুলে দিতে চাই, আপনাদের উচ্ছেদ চাই, এটাই আমাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণির অভিযোগ। ঠিক তাই। আমাদের সংকল্প ঠিক তাই।"

কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো, ১৮৪৮

ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের আওয়াজ তুলছে কারা— চিনে নিন

শিল্পপতি এবং বড় বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির সংগঠন অ্যাসোচেম আওয়াজ তুলেছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। এর ফলে নাকি ব্যাঙ্ক পরিচালকদের দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ববোধ বাড়বে। ওই সংগঠন সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, ব্যাঙ্কগুলির ঝামেলার দায় কতটা নিজের কাঁধে নেবে সে-ক্ষেত্রে সরকারের একটা সীমা মেনে চলা উচিত। সরকারের মনে রাখা প্রয়োজন এই টাকা করদাতাদের।

অ্যাসোচেম কর্তাদের কথাগুলি শুনলে মনে হতে পারে, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আমানতকারীদের টাকার নিরাপত্তা নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন এই সব পুঁজিপতিরা। সত্যিই কি তাই?

অ্যাসোচেম ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের আওয়াজ এমন একটা সময় তুলেছে যখন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ১১,৪০০ কোটি সহ প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা নিয়ে নীরব মোদি কোন বিদেশে পালিয়েছেন ভারত সরকার এখনও তার কোনও হদিশ করতে পারেনি। ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যবস্থা কত ঠুনকো, প্রতারণার এই ঘটনায় তা প্রকাশ্যে এসে গেছে। সরকার এফআরডিআই বিল আনার পর এমন ঘটনায় সাধারণ মানুষ ব্যাঙ্কে তাদের গচ্ছিত টাকার ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে। এই সময়েই ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র সংগঠনটি।

২০১৭-র মার্চের হিসেব অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের পরিমাণ প্রায় ৮১ লক্ষ কোটি টাকা। পুঁজিপতিদের লক্ষ্য সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ। কিন্তু এই ব্যাঙ্কগুলি তো ক'বছর আগেও লাভজনক ছিল, এখন লোকসান করছে কেন? লোকসানের কারণ, একদিকে বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণ, অন্য দিকে ক্রমাগত বাড়তে থাকা জালিয়াতি। গত বছর জুন পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৪ সালে যার পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ২৭ হাজার কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ টাকা ঋণ নিয়ে কারা শোধ দেয়নি? কৃষক, বেকার যুবক, ছোট দোকানদার কিংবা ছোট শিল্প-কারখানার মালিকরা? মোটেও না। তাদের ঋণ বাকি পড়লে ব্যাঙ্কের নির্দেশে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ছোটে কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে এনে হাজতে পুরতে। ঋণের নামে এই পুরো টাকাটাই মেরে দিয়েছে শিল্পপতি, পুঁজিপতি আর বড় বড় ব্যবসায়ীরা। এই ঋণের শতকরা ৭৮ ভাগই মাত্র ৫০টি কর্পোরেট মালিকের। বাকি ঋণটাও অন্য পুঁজিপতিদেরই। কিন্তু না, আজ পর্যন্ত কোনও ঋণখেলাপি পুঁজিমালিকের কোমরে দড়ি পড়েনি। তারা এই টাকা লোপাট করে দিয়ে বহাল তবিয়তেই আছে। তারাই আজ সাধু সেজে এসে সওয়াল করছে, ব্যাঙ্কগুলি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। দায়িত্ববোধের কী দারুণ পরিচয়!

এই কর্তারা সত্যিই করদাতাদের গচ্ছিত টাকা নিয়ে চিন্তিত হলে

দুয়ের পাতায় দেখুন

মিড ডে মিল কর্মীদের রাজভবন অভিযান

সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল। সংবাদ আটের পাতায়।

সিরিয়া আক্রমণকারী নয়, আক্রান্ত

স্মরণ করুন ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার। তিনি নাকি গোপনে ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের এমন বিপুল সম্ভার বানিয়ে ফেলেছেন, যা দিয়ে বিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। ফলে বিশ্ব শান্তির পাহারাদার মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ঝাঁপিয়ে পড়ল ইরাকের উপর। ধ্বংস করা হল দেশটাকে। বোমা মেরে মেরে ধ্বংস করা হল প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতার নিদর্শনগুলিকে। খুঁজে খুঁজে বের করা হল সাদ্দাম হোসেনকে গোপন ডেরা থেকে। বিচারের এক নিদারুণ প্রহসন ঘটিয়ে তাঁকে হত্যা করা হল, সেই ছবি প্রচারিত হল গোটা বিশ্বে। পরে প্রমাণিত হল গণবিধ্বংসী অস্ত্রের পুরোটাই সাম্রাজ্যবাদীদের বানানো এক গল্পকথা মাত্র। এরপর টার্গেট করা হল লিবিয়ার কর্নেল গদ্দাফিকে। সেই একই প্রচার, এবার আর বিচারের কোনও প্রহসন নয়, সরাসরি ন্যাটো বাহিনী প্রকাশ্য স্থানে নৃশংসভাবে হত্যা করল লিবিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান গদ্দাফিকে। দুনিয়া ধিক্কার দিল, থোড়াই কেয়ার করল বুশ-ব্লেয়ারের দল। এরপর কী? স্বভাবতই টার্গেটে এসে গেল সিরিয়া। একই ছক ধরে এগোচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীরা। কিন্তু সিরিয়াতে তারা বাধা পেল। আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গোষ্ঠী তৈরি করে তাদের যাবতীয় অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে তৈরি করা হল কিন্তু ইরাক লিবিয়ার মতো আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা গেল না। সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার কোনও সরকারকে সিরিয়ায় বসানো গেল না। বিশ্ব জনমত বলল, রাষ্ট্রপতি আসাদের শাসন যদি জনবিরোধী হয়, অত্যাচারী হয় তবে তাকে সরিয়ে কোনও সরকার বসাবার অধিকার একমাত্র সিরিয়ার জনগণের আছে। আমেরিকার তাতে নাক গলাবার কী অধিকার? কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা কোনও দিনই যুক্তির ধার ধারে না। ফলে আইসিস, আলকায়দা থেকে শুরু করে যত রকমের নৃশংস-নিষ্ঠুর সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আছে তাদের পূর্ণ মদত দিয়ে সিরিয়ার অভ্যন্তরে যুদ্ধ পরিস্থিতি জিইয়ে রাখা হল। ধ্বংস আর মৃত্যু হয়ে দাঁড়ালো রোজকার সংবাদ। এই পরিস্থিতিতেই পুঁজিবাদী রাশিয়া প্রমাদ গুনল। পূর্ব ইউরোপের ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলিতে ইতিমধ্যে ন্যাটো ঘাঁটি বসাতে শুরু করেছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার সমর্থক সরকারকে ফেলে দিয়ে পুরনো ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলোকে মার্কিন-ইউরোপীয় মদতে ক্ষমতায় নিয়ে আসা হল। রাশিয়ার কোনও ওজর আপত্তিকে পাত্তা দিল না পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা। রাশিয়া বুঝল তাকে সামরিকভাবে ঘিরে ফেলে বশ্যতা মানানোর যে পরিকল্পনা নিয়ে মার্কিন ব্রিটিশ শাসকরা এগোচ্ছে, এখনই পাল্টা কিছু না করলে যুদ্ধ তার ঘরে ঢুকে যাবে। ফলে সিরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিল রাশিয়া, এই যুক্তিতে যে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াইয়ে তারা সিরিয়ার পাশে দাঁড়াতে চায়। যে আলকায়দা আইসিসের মতো সন্ত্রাসবাদীরা ইরাক, লিবিয়ার পর সিরিয়ায় ঘাঁটি গেড়েছে, তাদের উৎখাত না করলে রাশিয়া বিপন্ন হবে। এ নিয়ে রুশ-মার্কিন বাকযুদ্ধ হল

ছয়ের পাতায় দেখুন

বেসরকারিকরণের আওয়াজ তুলছে কারা

একের পাতার পর

তো প্রথমেই তাদের চেম্বারের সদস্যদের সাবধান করত যে, তারা কেউ করদাতাদের টাকা এই ভাবে লোপাট করতে পারবে না! কই, তা তো তারা একবারও বলেননি। বলেননি যে, করদাতাদের টাকা কেউ লোপাট করলে চেম্বার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে! এরপরও কি বুঝতে অসুবিধা হয় যে, এই কপট দরদের একমাত্র উদ্দেশ্য যে কোনও প্রকারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির দখল নিয়ে করদাতাদের জমানো বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করা।

উল্লেখ করা দরকার, ব্যাঙ্কের এই টাকা কিন্তু এই সব শিল্পপতি-পুঁজিপতি-বৃহৎ ব্যবসায়ীদের জমা নয়, এরা তাদের ঋণের শর্তের কারণ ছাড়া কখনও একটি টাকাও ব্যাঙ্কে জমা রাখে না। এই জমা টাকার ৮৫ ভাগই দেশের সাধারণ মানুষের। তা ছাড়া যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে অপদার্থ এবং দায়িত্বহীন বলে দেগে দিয়ে সেগুলিকে আত্মসাৎ করতে চাইছেন অ্যাসোচেম কর্তারা, তারা নিজেরা কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ ঋণ বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে না নিয়ে সেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকেই নিয়েছেন। চতুরতার সীমা নেই এদের!

স্বাধীনতার পর থেকে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির দায়বদ্ধতা এবং দায়িত্ববোধের নজির দেখে চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল দেশের মানুষের। ১৯৬৮ সালে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করার আগে পর্যন্ত ৭৩৬টি বেসরকারি ব্যাঙ্ক সাধারণ মানুষের জমানো টাকা লোপাট করে দিয়ে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেছিল। '৬৮-র পরেও ৩৬টি বেসরকারি ব্যাঙ্ক তাদের 'পরম দায়িত্বশীলতা'র কারণে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় সরকারকে সেগুলি অধিগ্রহণ করতে হয়েছিল। আজ আবার সেই সব বেসরকারি সংস্থার পক্ষেই সওয়াল করতে নেমেছেন অ্যাসোচেম কর্তারা। বেসরকারি সংস্থাগুলি শুধু ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ না করে তাদের দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে এমন নয়, স্বাধীন ভারতে যতগুলি বড় অঙ্কের আর্থিক কেলেঙ্কারি হয়েছে তার প্রত্যেকটির পিছনেও রয়েছে কোনও না কোনও 'দায়িত্বশীল' জালিয়াত পুঁজিপতির হাত। এদের হাতেই সরকারি ব্যাঙ্কগুলি তুলে দেওয়া কি বিড়ালকে মাছ পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া নয়?

কিন্তু এই ফেরেববাজি এইসব জালিয়াত পুঁজিপতিরা চালিয়ে যেতে পারছে কী করে? খুব সহজেই যে পারছে এটা তো পরিষ্কার। না হলে মাত্র তিন বছরে ঋণখেলাপির পরিমাণ এমন অবিশ্বাস্য পরিমাণে বাড়তে পারত না। দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতির দল এটা বুঝে গেছে যে, তারা যতই ব্যাঙ্কের টাকা লোপাট করুক, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বর্তমান বিজেপি সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবে না, বরং এ ব্যাপারে তারা সরকারের পূর্ণ সহযোগিতাই পাবে। তাই দেশের তামাম সাধারণ মানুষ নীরব এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের জালিয়াতি নিয়ে যখন চরম উদ্বিগ্ন তখনও প্রধানমন্ত্রী পুরো ব্যাপারটা নিয়ে শুধু নীরবতাই পালন করে গেলেন। বিজেপির অন্য নেতা-মন্ত্রীরা এটা প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়, কয়েকজন অফিসার আর কেরানির গাফিলতি মাত্র। জালিয়াত পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে একটি কথাও তাঁরা কেউ উচ্চারণ করলেন না। একই সাথে দেশের মানুষ লক্ষ করল, বিজেপি সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রমানিয়ান কর্পোরেট কর্তাদের সাথে গলা মিলিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করলেন।

ব্যাঙ্ক জালিয়াতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় তারাতলা-বিএনআর এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল

পুঁজিপতিদের সাথে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল তথা নেতাদের এই কুৎসিত বোঝাপড়ার রূপটাকেই আধুনিক অর্থনীতির ভাষায় বলা হচ্ছে 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম'। পুঁজিবাদের এই স্তরে পুঁজিপতিরা আর আগের মতো উৎপাদন করে, ব্যবসা করে মুনাফা করার উপর নির্ভর করে না। একদিকে তীব্র বাজার সংকট, অন্য দিকে পুঁজির বিপুল কেন্দ্রীভবন হল বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে নেতা-মন্ত্রীদের সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে, পারস্পরিক লেনদেনের ভিত্তিতে জাতীয় সম্পত্তি তথা জনগণের সম্পদের অবাধ লুঠতরাজ চালানোটাই এই পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য। জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার এই অবাধ লুঠতরাজ, গ্যাস, তেল, কয়লা সহ খনিগুলির বেসরকারিকরণ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া এর অন্যতম নজির। কংগ্রেস আমলেও নেতা-মন্ত্রীদের সাথে পুঁজিপতিদের এই বোঝাপড়া ছিল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, তত এটা আরও নগ্ন এবং আরও মারাত্মক আকার নিচ্ছে। সরকার এবং প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি হু হু করে ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে জনস্বার্থ ভয়ঙ্কর ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অন্য দিকে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে দেশের সমস্ত সম্পদ গিয়ে জমা হচ্ছে। এটা কত মারাত্মক আকার নিয়েছে তা উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে। গত মাসেই আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফ্যাম প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ২০১৭ সালে ভারতে মোট সম্পদের ৭৩ শতাংশ কুক্ষিগত রয়েছে দেশের ১ শতাংশ ধনকুবেরের হাতে। গত বছর ছিল ৫৮ শতাংশ। এক বছরেই অতিরিক্ত ১৫ শতাংশ সম্পদ কুক্ষিগত করেছে এই ধনকুবেররা। ২০০০ সালে মোট সম্পদের ৩৬.৮ শতাংশ ছিল সব থেকে ধনী ১ শতাংশের হাতে। দুর্নীতি কী মারাত্মক আকার নিয়েছে তা প্রকাশ পেয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশিত ২০১৭-র করাপশন পারসেপশন ইনডেক্সে।

স্বাভাবিক ভাবেই এর ফল হিসাবে অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য। কংগ্রেস আমলে বোফর্স, টু জি, কয়লা সহ অসংখ্য বিশাল মাপের দুর্নীতি ঘটেছে। বিজেপি শাসনে দুর্নীতির ঢাকনা সবে খুলতেই কুৎসিত চেহারা বেরিয়ে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকারে বিজেপির আসীন হওয়ার এটাই ছিল শর্ত যে, তারা একচেটিয়া শিল্পপতি-পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীদের জন্য এই লুঠতরাজের ব্যবস্থা করে দেবে এবং তা চালাতে দেবে। তাই গত লোকসভা নির্বাচনে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বিজেপির হয়ে প্রচারে হাজার হাজার কোটি টাকা ঢেলেছে। এখনও দলের বিপুল বৈভব এবং নেতা-মন্ত্রীদের বিলাস-ব্যসনের ব্যয়ের জোগান দিয়ে চলেছে তারা।

বিনিময়ে তার বহুগুণ উশুল করছে জনগণের উপর বিপুল বোঝা চাপিয়ে, দেশের সম্পদ লুঠ করে। বিজেপির এই জনবিরোধী চরিত্র দেশের শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষের কাছে যত স্পষ্ট হচ্ছে তত তার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। এই অবস্থায় পুঁজিপতিরা যখন বুঝবে বিজেপিকে আর ক্ষমতায় রাখলে এই ক্ষোভ গণবিস্ফোরণের আকার নিতে পারে তখন আবার কংগ্রেস বা পুঁজিপতিদেরই স্বার্থরক্ষাকারী অন্য কোনও দল বা জোটকে ক্ষমতায় নিয়ে আসবে। পুঁজিপতিরা এভাবেই দ্বিদলীয় ভোট রাজনীতিতে জনগণকে ফাঁসিয়ে দিয়ে পুঁজির শোষণ অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাচ্ছে। ভোট রাজনীতির এই গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে এসে সংঘবদ্ধ হয়ে এই লুঠেরা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে এর হাত থেকে মুক্তি নেই।

জগদল্লায় কেকেএমএস সম্মেলন

২৬ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া ১ নং ব্লকের জগদল্লা অঞ্চলে অল ইন্ডিয়া কৃষক খেত মজদুর সংগঠনের আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ৭টি গ্রাম থেকে ৭০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি অংশ নেন। রাজ্য সম্পাদক কমরেড পঞ্চানন প্রধান, জেলা সম্পাদক কমরেড তারাশংকর গোপ ও জেলা সভাপতি কমরেড দিলীপ কুণ্ডু বক্তব্য রাখেন। কমরেড মাধব কুণ্ডুকে সম্পাদক ও কমরেড চিত্ত সীটকে সভাপতি করে ২১ জনের কমিটি গঠিত হয়।

জীবনাবসান

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ লোকাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড পঞ্চানন রায় ২০ ফেব্রুয়ারি ৬৭ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কুমারগঞ্জে পার্টির শুরু থেকে তিনি জমির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দলের সাথে যুক্ত হন। বিশেষ করে কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দলের বিস্তারের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। জমির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অন্যান্য দলের এবং প্রশাসনের রোষের মুখে পড়েও নির্ভয়ে দলের কাজ করেছেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে লোকালের সমস্ত সদস্য শ্রদ্ধা জানানোর জন্য উপস্থিত হন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

২৮ ফেব্রুয়ারি কুমারগঞ্জ লোকাল কমিটির উদ্যোগে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা ছিলেন পূর্বতন জেলা সম্পাদক কমরেড প্রণবেশ চৌধুরী, বর্তমান জেলা আহ্বায়ক কমরেড গোপেশ মহন্ত, লোকাল সম্পাদক কমরেড রণজিৎ দেব।

কমরেড পঞ্চানন রায় লাল সেলাম

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর উত্তর লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড সন্তোষ মণ্ডল আকস্মিক সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

কমরেড সন্তোষ মণ্ডল সত্তরের দশকের গোড়ায় 'ঝড়' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করার সূত্রে দলের বৈপ্লবিক চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং ধীরে ধীরে দলের একজন নির্ভরযোগ্য কর্মী হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলেন। তিনি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের জরুরি পরিষেবা ক্ষেত্রে চাকরি করতেন। প্রয়োজনে ছুটি নিয়েও দলের কর্মসূচিতে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। কমরেড সন্তোষ মণ্ডল রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মচারী সংগঠন পাওয়ার মেন্স ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ছিলেন শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সহ সভাপতি।

গরিব ঘরের সন্তান ছিলেন তিনি। বিদ্যুৎ পর্ষদের চাকরির উপর নির্ভর করে বিশাল পরিবারের দায়িত্ব পালন করেও হাসিমুখে দলীয় কাজ করতেন। খোলা মনের উদার মানুষ হিসাবে সকলের সাথে সুসম্পর্ক ছিল। তাঁর থেকে বয়সে অনেক ছোট কারও অধীনেও হাসিমুখে কাজ করে যেতে তাঁর কখনও অসুবিধা হয়নি।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনেই দলের কর্মী-সমর্থকরা প্রথমে হাসপাতালে পরে জেলা অফিসে ছুটে আসেন। জেলা অফিসে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল ও কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিংহ-র পক্ষে এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কুণাল বিশ্বাসের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। এ ছাড়াও জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন গণসংগঠন ও 'ঝড়' পত্রিকার পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড মণ্ডলের দুই ছেলে এবং জামাই।

কমরেড সন্তোষ মণ্ডল লাল সেলাম

কার্ল মার্কসের মূল্যতত্ত্ব

এলিয়নর মার্কস

ডেভিড রিকার্ডো তাঁর মহাগ্রন্থ 'প্রিন্সিপলস অব পলিটিক্যাল ইকনমি অ্যান্ড ট্যাক্সেশন'-এর সূচনায় বলেছেন, 'কোনও পণ্যের মূল্য কিংবা যার সঙ্গে তার বিনিময় ঘটবে সেই পণ্যের পরিমাণ, তার উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমের আপেক্ষিক পরিমাণের উপর নির্ভর করে, সেই শ্রমের জন্য কম বা বেশি পরিমাণে দেয় ক্ষতিপূরণের উপর নির্ভর করে না।' মূল্যের যে 'একটি মাত্র' প্রকৃত পরিমাণ আছে, যেটা হল শ্রম, রিকার্ডোর এই বিরাট আবিষ্কার, মার্কসের 'ক্যাপিটাল'-এর সূচনাপর্ব রচনা করেছে। রিকার্ডোর মূল্যতত্ত্ব মার্কস কীভাবে পূর্ণাঙ্গ করেছেন এবং কিছুটা সংশোধনও করেছেন, এবং তার থেকে মুদ্রা ব্যবস্থার মতো এক তুমুল বিতর্কিত বিষয়ে প্রাঞ্জল, সহজ, যুক্তির শক্তিতে বলিষ্ঠ এক তত্ত্ব রচনা করেছেন সাধারণ বুদ্ধির অনেক রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদের কাছে যা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে আপাতত আমি তার আলোচনায় যেতে চাই না। যে মূল্য তত্ত্বের ভিত্তিতে মার্কস পুঁজির উৎস ও তার অবিরাম সঞ্চয় প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন, যা কেবল একটি সুবিধাভোগী শ্রেণির হাতে জমে উঠেছে আমি কেবল সেই তাত্ত্বিক পদ্ধতির আলোচনায় নিজেকে সীমিত রাখব।

ধরা যাক, সমস্ত পণ্যের বিনিময় খুবই ন্যায্যভাবে হচ্ছে। ধরা যাক, প্রতিটি ক্রেতা তার টাকার বদলে পণ্যে তার পুরো মূল্য পায় এবং প্রতিটি বিক্রেতা তার দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমের পুরো মূল্য টাকায় পেয়ে যায়। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদদের অভ্যস্ত অনুমান অনুসারে প্রতিটি উৎপাদনকারী সেই দ্রব্য বিক্রয় করবে যার জন্য তার নিজের কোনও চাহিদা নেই এবং এর থেকে পাওয়া টাকায় কেবল সেই দ্রব্য কিনবে যা সে নিজে উৎপাদন করে না। এই রকম একটা অর্থনৈতিক দুনিয়ায় সবই চলবে খুব ভাল করে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে যেমন বোঝায় সেইভাবে পুঁজির গঠনও চলতে থাকবে যথারীতি। একজন লোক টাকা জমাতে পারে, মালপত্র মজুত করে রাখতে পারে, কিন্তু সেটাকে তখনও সে পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করতে পারে না। যদি না অবশ্য সেই টাকা কাউকে সুদের বিনিময়ে ধার দেয়। কিন্তু সেটা বহুকালের পুরনো রীতি হলেও আসলে একটা অত্যন্ত নিম্নস্তরের আদিম ধরনের পুঁজি মাত্র। এই ধারণার ভিত্তিতে মুনাফা অর্জন করার চিন্তা করাও অসম্ভব।

কীভাবে মুনাফার উদ্ভব

কিন্তু আমরা দেখছি প্রতিদিনই মুনাফা হচ্ছে এবং কিছু লোক বিরাট মুনাফা করছে। তার কারণ ব্যাখ্যার জন্য যে লেনদেনের মাধ্যমে মুনাফার উদ্ভব, তার 'কাঠামো'র দিকে নজর দেওয়া দরকার। আমরা উপরে যাদের কথা বলেছি তারা হল স্বাধীন উৎপাদনকারী, যারা সামাজিক শ্রম বিভাজনের এক বিশেষ ব্যবস্থায় সেই দ্রব্য বিক্রয় করে যার জন্য তাদের কোনও চাহিদা নেই এবং সেইসব দ্রব্য নিজেদের ব্যবহারের জন্য কেনে যা তারা উৎপাদন করে না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে উৎপাদনকারী হল এমন একজন মানুষ যে বাজারে যায় পণ্য নিয়ে নয়, টাকা নিয়ে এবং যা তার দরকার তা না কিনে এমন সব দ্রব্য সে কেনে যা তার নিজের ব্যবহারের জন্য দরকার নেই। এক কথায় সে সেইসব দ্রব্য কেনে যা সে পুনরায় বিক্রয় করতে পারবে। কিন্তু ১০০ পাউন্ড দিয়ে ২০ টন লৌহপিণ্ড কিংবা ১০০ গাঁইট তুলা কিনে আবার ১০০ পাউন্ডে সেটা বিক্রয় করা নিতান্ত অসম্ভব। আমাদের ব্যবসায়ীদের সেইরকম কোনও অবাস্তব কাজ করতে দেখা যায় না। সে পণ্য কেনে ধরা যাক ১০০ পাউন্ডে, তারপর সেটা বিক্রয় করে ধরা যাক ১১০ পাউন্ডে। কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব হবে? আমরা এখনও অনুমান করছি যে, সমস্ত পণ্যের কেনা-বেচা হয় তাদের পূর্ণ শ্রম-মূল্যে। তা হলে এই ধরনের সমস্ত কেনা-বেচায় কোনও মুনাফা হতে পারে না। ক্রীত এবং বিক্রীত পণ্যের মূল্যে কোনও পরিবর্তন ঘটলে, যেমন তুলার দাম আমেরিকার গৃহযুদ্ধে চড়ে যাওয়ায়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে কেন মুনাফা হয় তার অসংলগ্ন ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পণ্যের মূল্যে সাধারণত কোনও বৃদ্ধি ঘটে না। তাদের গড় মূল্য ও দামের সাধারণত ওঠানামা ঘটতে থাকে। ফলে একবার যা লাভ হল পরের বার সেটা ক্ষতিতে দাঁড়ায়। সম মূল্যে বিনিময়ের যে অনুমান থেকে আমরা শুরু করেছি সেখানে মুনাফা অসম্ভব।

বেশ, এবার ধরা যাক, বিনিময় সমান নয়। ধরা যাক প্রতিটি বিক্রেতা তার দ্রব্য প্রকৃত মূল্যের চেয়ে ১০ শতাংশ বেশিতে বিক্রয় করতে পারে। তা হলে কোনও লোক বিক্রেতা হিসেবে যা লাভ করছে ক্রেতা হিসাবে সেটা আবার খোয়ায়। আবার দেখা যাক প্রতিটি ক্রেতা তার কেনা জিনিসের প্রকৃত মূল্যের ১০ শতাংশ কমে কিনতে পারে। তা হলে ক্রেতা হিসেবে সে যেটা লাভ করে বিক্রেতা হিসাবে সেটা তার হাতছাড়া হয়ে যায়।

শেষপর্যন্ত ধরা যাক লোক ঠকিয়েই কেবল মুনাফা হয়। আমি ৫ পাউন্ডে যে এক টন লোহা বিক্রয় করলাম ধরা যাক তার আসল দাম ৩ পাউন্ডের বেশি নয়। সে ক্ষেত্রে আমি ২ পাউন্ডে ধনী আর আপনি ২ পাউন্ডে গরিব হয়ে গেলেন। কেনা-বেচার আগে আপনার ৫ পাউন্ড আর আমার লোহার মূল্য স্বরূপ ৩ পাউন্ড ছিল— দু'জনের মোট ছিল ৮ পাউন্ড। ব্যবসার পরে আপনার হাতে গেল ৩ পাউন্ড মূল্যের লোহা আর আমার হাতে ৫ পাউন্ড। কিন্তু যোগফল এবারেও সেই ৮ পাউন্ড। এখানে মূল্য কেবল হস্তান্তরিত হয়েছে, নতুন মূল্য সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু মুনাফা প্রকৃতই হতে গেলে নতুন মূল্য সৃষ্টি করতে হবে। এটা সহজেই অনুমেয় যে কোনও দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি, শ্রেণি হিসাবে নিজেকে ঠকাতে পারে না।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, সমান দ্রব্যের বিনিময় ঘটলে মুনাফা অসম্ভব, আবার যদি অসম দ্রব্যের বিনিময় ঘটে তাহলেও মুনাফা সমভাবেই অসম্ভব। কিন্তু তবু মুনাফা হয়। তা হলে এই অর্থনৈতিক রহস্যের সমাধান কীভাবে হবে?

মুনাফা প্রকৃতই হতে গেলে নতুন মূল্য সৃষ্টি করতে হবে

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পুণর্বিক্রয়ে যে মূল্যবৃদ্ধি মুনাফা হিসাবে আসে এবং যা টাকাকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করে, তার উদ্ভব সেই টাকা থেকে হতে পারে না। কারণ, ক্রয় ও বিক্রয়ে টাকা এখানে ক্রীত ও বিক্রীত পণ্যের মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে (এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে সমস্ত বিনিময় ঘটছে সমান জিনিসের মধ্যে)। একইভাবে কোনও পণ্যের মূল্য থেকেও মুনাফার উদ্ভব হতে পারে না, যা পূর্ণ মূল্যে কেনা-বেচা করা হয়েছে, কম বা বেশি কিছুতে নয়। সুতরাং আলোচ্য পণ্যের 'প্রকৃত ব্যবহার' থেকেই কেবল মুল্য বৃদ্ধি ঘটতে পারে। কিন্তু পণ্যের ব্যবহার অর্থাৎ ভোগ থেকে কীভাবে নতুন মূল্যের উদ্ভব ঘটবে? আমাদের উল্লিখিত ব্যবসায়ীর যদি কপাল ভাল হয় তা হলে বাজারে সে অবশ্য দেখতে পাবে এমন কোনও পণ্য আছে যার কোনও বিশেষ গুণের জন্য ভোগের মাধ্যমেই নতুন মূল্য সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বাজারে সেই রকম পণ্য অবশ্যই আছে। অর্থনীতিবিদরা সেই পণ্যকে বলেন 'শ্রম'। কিন্তু মার্কস আরও সঠিকভাবে তাকে বলেছেন 'শ্রম-শক্তি'। আমি এখানে এই শ্রম-শক্তি শব্দটিই ব্যবহার করব।

বাজারে পণ্য হিসাবে শ্রম-শক্তির অস্তিত্বের পিছনে ধারণা হল যে তার মালিক সেটি বিক্রয় করেছে। সুতরাং সেই মালিক একজন স্বাধীন এজেন্ট, যে তার শ্রম-শক্তি আর একজন স্বাধীন এজেন্টের কাছে বিক্রয় করেছে। তারা দু'জনে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, সমতার ভিত্তিতে এই কেনা-বেচা করেছে। আরও অনুমিত হয়েছে যে, এই বিক্রয় ঘটেছে একটা সীমিত সময়ের জন্য, অন্যথায় বিক্রেতা একজন স্বাধীন এজেন্ট থেকে ক্রীতদাসে পরিণত হবে। এবং সর্বশেষ অনুমান হল, শ্রম-শক্তির মালিক, ভবিষ্যৎ শ্রমিক, অন্য কোনও পণ্য তার শ্রমের ফসল বিক্রয় করতে পারে না। সে পরিবর্তে কেবল নিজের শ্রমের সামর্থ্য বিক্রয় করে থাকে। সুতরাং আমাদের ব্যবসায়ীটি এমন একটা সমাজে বাস করে যেখানে বাজারে স্বাধীন শ্রমিক পাওয়া যায়, যে কেবল তার শ্রম-শক্তি বিক্রয় করার মতোই স্বাধীনতা ভোগ করে, কিন্তু এমন কোনও উপকরণের দখল তার হাতে নেই যাতে সে স্বাধীন ভাবে নিজের শ্রম-শক্তিকে প্রকৃত শ্রম, অর্থাৎ কাজে রূপান্তরিত করতে পারে। সুতরাং সে এমন একজন মুক্ত মানুষ, যার দুয়েকটি সস্তা সাদামাটা ধরনের উপকরণ ছাড়া, খাদ্যদ্রব্য, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নিজের বলতে কিছুই নেই।

আমাদের এই দুই স্বাধীন এজেন্ট বাজারে যে পরস্পরের মুখোমুখি হয়, সেটা নিশ্চয়ই সরল প্রাকৃতিক কারণে ঘটে না। এটা হল এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল, সমাজে আগেকার বহু বিপ্লব যা সম্ভব করেছে। এবং বাস্তবিক পক্ষে পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধ থেকে দেখতে পাই যে বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্রমেই নিজের শ্রম-শক্তির এই ধরনের 'স্বাধীন' বিক্রেতায় পরিণত হয়েছে।

শ্রমশক্তি এমন এক পণ্য যা মূল্য সৃষ্টি করতে পারে

এই শ্রম-শক্তি একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য। তার মূল্য আছে এবং যে কোনও পণ্যের মতো দাম আছে। অন্যান্য সব বিষয়ের মতো এটির মূল্যও তার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তারও পুনরুৎপাদন ঘটে। শ্রম-শক্তির মূল্য হল শ্রমিককে তার কাজের উপযোগী সামর্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে সব আবশ্যিক দ্রব্য ব্যবহার করতে হয় তাদের মূল্যের এবং যেহেতু প্রাকৃতিক কারণে তার ক্ষয় ও মৃত্যু ঘটে তাই শ্রম-শক্তি বিক্রয়কারীদের ধারা অব্যাহত রাখতে বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা বজায় রাখার মূল্যের সমান। এই সব আবশ্যিক দ্রব্যের উপকরণ ও বৈচিত্র্য বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন। কিন্তু কোনও একটি দেশে এবং নির্দিষ্ট কালপর্বে সেগুলি মোটামুটি অপরিবর্তনীয় ও নির্দিষ্ট। শ্রমিক শ্রেণির জীবনমান সেই নির্দিষ্টতার মাত্রা স্থির করে থাকে।

এখন দেখা যাক আমাদের এই ব্যবসায়ীটি যে শ্রম-শক্তি কিনেছে সেটা কীভাবে ভোগ বা ব্যবহার করে। ধরা যাক কাজটি হল সুতাকাটা। ভাড়া করা শ্রমিককে কারখানায় নিয়ে যাওয়া হল যেখানে সে তার কাজের জন্য দরকারি সব উপকরণ পেল। অর্থাৎ তুলো এমন একটা অবস্থায় রয়েছে যার থেকে সুতো তৈরি করা যাবে, তার সব যন্ত্রপাতিও মজুত আছে। ধরা যাক, একজন সুতো কাটনির প্রতি ঘণ্টায় স্বাভাবিক উৎপাদন হল ১$^{১}/_{৩}$ পাউন্ড সুতো, তার জন্য ১$^{১}/_{৩}$ পাউন্ড তুলো লাগে, (অনিবার্য অপচয় এখানে হিসাবে ধরা হচ্ছে না)। ছয় ঘণ্টা কাজ করলে একজন কাটনি ১০ পাউন্ড তুলো থেকে ১০ পাউন্ড সুতো কাটবে। যদি প্রতি পাউন্ড তুলোর মূল্য ১ শিলিং হয়, তা হলে ১০ পাউন্ড সুতো ১০ শিলিং মূল্যের তুলোর প্রতিনিধিত্ব করবে। ধরা যাক এই ছয় ঘণ্টায় যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি, তেল কয়লা বাবদ আরও ২ শিলিংয়ের মতো মূল্য ব্যয়িত হয়েছে। তা হলে সুতোর মূল্য দাঁড়াবে এখন ১২ শিলিং। কাটনির শ্রমের জন্য এই মূল্যে আর কতটা বৃদ্ধি ঘটবে সেটাই এবার আমাদের জানতে হবে।

শ্রমশক্তির চেয়ে শ্রম বেশি মূল্য সৃষ্টি করে

ধরা যাক শ্রম-শক্তির একদিনের মূল্য, অর্থাৎ শ্রমিককে একদিন কর্মক্ষম রাখার জন্য আবশ্যিক দ্রব্যাদির মূল্য হল ৩ শিলিং। আরও ধরা যাক যে আবশ্যিক দ্রব্যাদির যোগফল অথবা টাকায় যা হল ৩ শিলিং সেটি একজন শ্রমিকের ছয় ঘণ্টা শ্রমের মূর্তরূপ বা তার সমান। সুতরাং এই কাটনি ছয় ঘণ্টা কাজ করার পরে সুতোয় আরও ৩ শিলিং মূল্য যোগ করেছে। ফলে তার মোট মূল্য দাঁড়িয়েছে ১৫ শিলিং। আমাদের ব্যবসায়ী একজন পাকাপোক্ত সুতো উৎপাদনকারী। সে তার লগ্নি করা টাকার সমান মূল্য পেয়ে গেছে সুতোর মধ্যে ১০ শিলিং সুতো, ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ২ শিলিং এবং নিয়োজিত শ্রম-শক্তির জন্য ৩ শিলিং— মোট ১৫ শিলিং। প্রতিটি কড়ি যা সে আগাম খরচ করেছে সুতোর মূল্যে সেই টাকা তার ফেরত এসেছে। কিন্তু এখানে মুনাফার কোনও বাড়তি টাকা নেই। আমাদের সেই ঝানু ব্যবসায়ী বা আগামী দিনে পুঁজিপতি এখনই বলবে সে তার ব্যবসা মোটেই এই রকম করে বোঝে না। যদি ছয় ঘণ্টা কাজ করে একজন শ্রমিক সারাদিনের অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মতো কর্মক্ষমতা বজায় রাখার মতো রসদ পায়, তা হলে সেই শ্রমিক কেন সারাদিন কাজ করবে না তার কোনও যুক্তি নেই। লগ্নিকর্তা শ্রমিককে অর্থাৎ তার শ্রম-শক্তি সারাদিনের জন্যই ভাড়া করেছে। সুতরাং সারাদিনের শ্রমই তার প্রাপ্য। শ্রম-শক্তির মূল্য, আর যে শ্রম করতে পারে তার মূল্য, দুটো হল স্বতন্ত্র জিনিস। তাই যদি হয় তা হলে শ্রমিকের প্রাপ্য হল প্রথমটি আর দ্বিতীয়টি পাবে নিয়োগ কর্তা। শ্রম কেবল সম্পদ ও মূল্যের উৎস নয়, শ্রম করার জন্য যে শ্রম-শক্তি দরকার তার চেয়েও বেশি মূল্য উৎপাদনকারী। ঠিক সেই কারণেই নিয়োগ কর্তা শ্রমিক নিয়োগ করেছে।

সুতরাং ছয় ঘণ্টা কাজের পর শ্রমিককে ছুটি দেওয়ার বদলে সে তাকে আরও ছয় ঘণ্টা কাজ করায়। অর্থাৎ শ্রমিক মোট ১২ ঘণ্টা কাজ

প্রতি পাউন্ড ১ শিলিং হারে ২০ পাউন্ড তুলো —	১ পাউন্ড
১২ ঘণ্টার জন্য ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ২ শিলিং x ২ —	৪ শিলিং
১২ ঘণ্টার জন্য শ্রমের ফলে যুক্ত —	৬ শিলিং
২০ পাউন্ড সূতার মূল্য —	১ পাউন্ড ১০ শিলিং
নিয়োগ কর্তার লগ্নি	
২০ পাউন্ড সূতা (উপরের হিসাবে) —	১ পাউন্ড
ক্ষয়ক্ষতি (উপরের হিসাবে) —	৪ শিলিং
কাটনিকে প্রদত্ত মজুরি —	৩ শিলিং
	১ পাউন্ড ৭ শিলিং
মুনাফার মার্জিন —	৩ শিলিং

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের দাম ৫০ শতাংশ কমানোর দাবি উত্তরবঙ্গেও

বিদ্যুৎ মাশুল ৫০ শতাংশ কমানোর দাবিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে অ্যাবেকার পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। উত্তরবঙ্গের ৫ জেলা থেকে চার শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহকের উপস্থিতিতে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক কাজল চক্রবর্তী, আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির পক্ষে পীযূশ শর্মা, জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক অমল রায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ অজিত রায়, অধ্যাপক তামসরঞ্জন মজুমদার, কালিম্পং জেলা কমিটির সভাপতি এল এম শর্মা, দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক শংকর পাল এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের পক্ষে বীরেন মহন্ত।

সভায় অন্যতম বক্তা ছিলেন অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী। কালিম্পং জেলার সঙ্গীত গোষ্ঠী কর্তৃক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

চাকরির বিজ্ঞাপনই সার, রেলে চলছে কর্মসংকোচন

রেল এ বছর বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, গ্রুপ-ডি পদে ৮৯,৪০৯ জন কর্মী নিয়োগ করা হবে। গোটা দেশের চাকরি প্রার্থীদের কাছে এটা একটা বড় খবর নিশ্চয়ই। কিন্তু পাশাপাশি বহু সংশয়ও রয়েছে তাদের মধ্যে। ২০১৫ সালের বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে নিয়োগ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তার মধ্যেই হঠাৎ করে এত লোক নেওয়ার ঘোষণা কি আদৌ বাস্তবায়িত হবে?

রেলে লোক হয়ত নেওয়া হবে কিছু। কারণ, শ্রম ছাড়া, শ্রমিক ছাড়া পৃথিবী অচল। ফলে, লোক কিছু নিতেই হবে। বিশেষ করে যেখানে দীর্ঘকাল ধরে রেলে প্রায় ২ লক্ষ পদ খালি পড়ে রয়েছে। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যসভায় বলেছিলেন, "রেলের মতো যে কোনও বড় সংস্থায় সব সময়ই 'কিছু পদ' ফাঁকা থাকে। এখানে কর্মী নিয়োগের কাজটা হল একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।" যদিও, তারপর নিয়োগ নয়, বরং শুরু হয়েছিল মোট পদের সংখ্যাটাকেই কমিয়ে দেওয়ার লাগাতার প্রক্রিয়া। রেল পরিষেবার জন্য নির্ধারিত মোট ১৭ লক্ষ পদ ছেঁটে ২০০৪-০৫ সালে, নীতিশকুমার-লালুপ্রসাদের আমলে করা হয়েছিল ১৪ লক্ষ এবং তখনই ২০১০ সালের মধ্যে আরও ২ লক্ষ কমাবার পরিকল্পনাও হয়েছিল। পরিসংখ্যান বলছে, সে পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। রেল মন্ত্রকের নিজস্ব তথ্যানুসারে কর্মীসংখ্যা বছরে বছরে কীভাবে কমেছে তা নিচের পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাবে।

১৯৯০-৯১ বর্ষে কর্মীসংখ্যা ছিল ১৬,৫১,৮০০, পরবর্তী দশ বছরে কমে ২০০০-০১ বর্ষে দাঁড়ায় ১৫,৪৫,৩০০। পরের দশ বছরে আরও কমে ২০১০-১১ বর্ষে হয় ১৩,৩২,০০০, যা ২০১৪-১৫ বর্ষে হয় ১৩,২৬,৩০০ এবং ২০১৫-১৬ বর্ষে হয়েছে ১৩,৩১,৪০০।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, রেলের বিভিন্ন ডিভিশনে নামমাত্র কিছু নিয়োগ চললেও সামগ্রিক ভাবে কর্মী সংখ্যা কমানো হচ্ছে। যার পরিণতিতে একদিকে সুষ্ঠু যাত্রী পরিষেবার ব্যাপক অভাব, অন্য দিকে দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে দেদার। অথচ, প্রতি বছর নানা ভাবে রেলের ব্যবসা বাড়ছে, আয় বাড়ছে।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপি আসার পর রেল ক্ষেত্রে কিছু কি বদলেছে? না, মন্ত্রীদের মুখ এবং তাঁদের ভাষণ দেওয়ার ভাবভঙ্গি ছাড়া আর কিছুই বদলায়নি। সেই একই কর্মী-সংকোচন নীতি, বেসরকারিকরণ ইত্যাদি সবই আগের কংগ্রেস সরকারের মতোই চলছে। তা হলে, নতুন কিছুই হয়নি? হ্যাঁ, সাধারণ টিকিটের ব্যাপক দামবৃদ্ধি হয়েছে, চাকরিতে নিয়োগসংক্রান্ত পরীক্ষাব্যবস্থা অন-লাইন করা হয়েছে এবং আবেদন-ফর্মের দাম বাড়ানো হয়েছে। কেন্দ্রে ক্ষমতায় যাওয়ার আগে বিজেপি প্রতি বছর ২ কোটি চাকরি দেওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু কোথায় চাকরি? কোথায় কর্মসংস্থান? চাকরি নেই। আছে চাকরির নামে খালি এই পরীক্ষা আর সেই পরীক্ষা। তারপর হঠাৎ পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া। আবার পরীক্ষা নেওয়া। নিজেরাই মামলা-মোকদ্দমা-বাধিয়ে দিয়ে নিয়োগের প্যানেল নিয়ে টাল-বাহানা করা। আরও কত কী! কেন হয় না খালি পদগুলিতে নিয়োগ?

দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে এই প্রশ্ন জোরালো ভাবে উঠতে শুরু করেছে। বিজেপির 'সুদিন'-এর গালগল্প বুদবুদের মতোই অতি দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে। ধর্মের নামে বিদ্বেষ-বিভাজন হালে পানি পাচ্ছে না। 'উন্নয়নে'র মুখোশ খসে ধনতন্ত্রের বীভৎস মুখটা প্রকাশ্যে এনে দিচ্ছে একের পর এক দুর্নীতি। মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখছে বিজেপি আজ প্রকাশ্যে মালিক শ্রেণির পাশে দাঁড়িয়ে গেছে। ফলে, ২০১৯-এর লোকসভা ভোটকে লক্ষ রেখেই যে 'রেলে প্রচুর চাকরি'র বিজ্ঞাপন, তা স্পষ্ট।

বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ স্মরণ

রাজস্থান ঃ ঝুনঝুনুতে এ আই ডি ওয়াই ও-র পক্ষ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ স্মরণে ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পিলানির আজাদ পার্কে এই অনুষ্ঠানে বহু সাধারণ মানুষ, ছাত্র-যুব-মহিলা ও শিশুরা সমবেত হয়ে শ্রদ্ধা জানান। সংগঠনের রাজ্য অফিস সম্পাদক কমরেড ফণি মনি বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডি ওয়াই ও-র ঝুনঝুনু জেলা সম্পাদক কমরেড বিষ্ণু ভার্মা। শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

জয়পুরের লুনিয়াবাস বাসস্ট্যান্ডে এক অনুষ্ঠানে চন্দ্রশেখর আজাদ স্মরণে বক্তব্য রাখেন কমরেড প্রদীপ শর্মা এবং কমরেড অরুণ সিং।

উত্তরপ্রদেশ ঃ জৌনপুরে ২৭ ফেব্রুয়ারি এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং কমসোমল যৌথভাবে জেলার বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে অমর শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে
মেদিনীপুরে যুববিক্ষোভ

সকল বেকারকে কাজ, কাজ না দেওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত বেকার ভাতা, সরকারি শূন্যপদে দ্রুত স্থায়ী নিয়োগ, মদ-জুয়া-সাট্টা ও ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ২৭ ফেব্রুয়ারি যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও-র ডাকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি রূপায়িত হয়। তার আগে দেড়শো যুবকের সুসজ্জিত মিছিল জেলা শহর পরিক্রমা করে। জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অঞ্জন মুখার্জী, ও যুব নেতা মানিক পড়্যা, সুশান্ত পাণিগ্রাহী। পরে জেলা সম্পাদক কমরেড সূর্য পড়্যা ও অনিন্দিতা জানার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন দেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে গণস্বাক্ষর অভিযান চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

মুজফফরপুরে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

মুজফফরপুরের কাঁটি ব্লকে ক্রমবর্ধমান অপরাধমূলক কার্যকলাপ ও এন টি পি সি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারণে এলাকায় জলসংকটের প্রতিবাদে এবং ভূমিহীনদের বাস্তুজমি দেওয়ার দাবিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি বিডিও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে ১৯ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি বিডিও-র কাছে পেশ করা হয়।

নদিয়া মোটরভ্যান চালকদের জেলাশাসক দপ্তর অভিযানে আন্দোলনের জয়

সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের আহ্বানে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২ সহস্রাধিক মোটরভ্যান চালকের মিছিল কৃষ্ণনগরে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। বেশ কিছু দিন ধরে জেলার বিভিন্ন থানায় মোটরভ্যান আটক করে পুলিশ মাথা পিছু হাজার-বারোশো টাকা আদায় করছিল। এর ফলে গরিব মোটরভ্যান চালকরা রোজগার হারিয়ে পথে বসেছেন। ইউনিয়নের জেলা সভাপতি কেষ্ট চৌধুরীর নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধি দল আধিকারিকদের কাছে ডেপুটেশন দেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদের জানানো হয় মোটরভ্যান যাতে আটক করা না হয় তা তাঁরা দেখবেন।

প্রশাসন যাতে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বাধ্য হয় তার জন্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত ভ্যানচালকদের আহ্বান জানান সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জয়ন্ত সাহা।

কালচিনিতে ছাত্রবিক্ষোভ

এআইডিএসও কালচিনি ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি বিডিওকে দাবিপত্র পেশ করা হয়। কালচিনিতে কলেজ স্থাপন, বন্ধ চা বাগানের ছাত্রদের ফি মকুব, বিধানচন্দ্র হিন্দি হাইস্কুলে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, কালচিনি-আলিপুরদুয়ার এনবিএসটিসি-র বাস চালু, শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ, ইউনিয়ন অ্যাকাডেমিতে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণিতে কমার্স বিভাগ চালু প্রভৃতি দাবিতে মিছিল করে ছাত্রছাত্রীরা বিডিওকে স্মারকলিপি দেয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের ব্লক সম্পাদক কমরেড কুশল বড়াইক এবং সভাপতি কমরেড শচীন ঝা।

শিলিগুড়িতে মহিলা সমাবেশ

নারী-শিশু নির্যাতন রুখতে ও মাদক, অশ্লীলতা প্রসারের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থার দাবিতে ৭ ফেব্রুয়ারি এআইএমএসএস-এর ডাকে বিশাল মহিলা মিছিল শিলিগুড়ি শহর পরিক্রমা করে। বাঘাযতীন পার্কের সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য কমরেড মিনতি সরকার। সভাপতিত্ব করেন কমরেড কাবেরী গাঙ্গুলী, দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কমরেড শিখা নন্দী এবং হলদিবাড়ির নেত্রী কমরেড তুলি সরকার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

কালীগঞ্জ বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ

রাস্তায় গাড়ি চেকিং-এর নামে পুলিশের তোলাবাজি বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতি ও স্বজন-পোষণ বন্ধ, মদ ও হেরোইন বিক্রি বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, দেবগ্রাম সহ কালীগঞ্জ ব্লকের হাসপাতালগুলিতে ২৪ ঘণ্টা ডাক্তার-নার্সের ব্যবস্থা সহ ১৪ দফা দাবিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) দেবগ্রাম লোকাল কমিটি ও পলাশী শাখার উদ্যোগে কালীগঞ্জ বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস বসির আহমেদ, মহিউদ্দিন মণ্ডল, লোকাল সম্পাদক কমরেড কামাল উদ্দিন সেখ ও কমরেড অশোক ঘোষ। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড হরবোজ আলি সেখের নেতৃত্বে ৬ জনের প্রতিনিধি দল কালীগঞ্জ বিডিও-র হাতে স্মারকলিপি প্রদান করে বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

নোটবন্দি-জিএসটি অর্থনীতির সর্বনাশ করবে জানতেন না জেটলি, কেমন অর্থমন্ত্রী তিনি!

‘নোটবন্দির ফলেই অর্থনীতির ইঞ্জিন বিগড়ে গিয়েছিল’— ২০১৭-১৮ সালের আর্থিক সমীক্ষা পেশ করতে গিয়ে এ কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। নোট বাতিল হয়েছিল ২০১৬ সালের নভেম্বরে। এই বোধোদয় হতে তাঁর ১৫ মাস লেগে গেল! অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, নোট বাতিলে দেশের সাধারণ মানুষের দুর্দশাই শুধু বেড়েছে। কালো টাকার মালিক শিল্পপতিদের গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন মার খেয়েছে। অর্থনীতি-বিজ্ঞানের অআকখ বুঝলেই এটা বোঝা যেত, যে এমনটাই ঘটবে।

তাঁরা সে সময় জোরের সাথে বলেছিলেন নোট বাতিলের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। বলেছিলেন, কালো টাকা উদ্ধার হবে, ইচ্ছাকৃত ঋণখেপাপিদের শায়েস্তা করা হবে, দেশের প্রতিটি সাধারণ মানুষ এর সুফল পাবেন— এমন নানা শ্রুতিমধুর প্রতিশ্রুতিতে মানুষের মন জয়ের চেষ্টা করেছিল। নোট বাতিলের ফলে তৈরি হওয়া সংকটে ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ এই প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ভেবেছিলেন, নিশ্চয় কিছু একটা হবে! কী হল? ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে বেশ কিছু মানুষের মৃত্যু আর গোটা দেশের জনগণের চূড়ান্ত হয়রানি ছাড়া আর কী হয়েছে? নোট বাতিলের পর বছর ঘুরে গেছে, কত কালো টাকা উদ্ধার হল, দেশের মানুষকে তা জানাতেই পারেনি সরকার। একজন কালো টাকার কারবারিকেও চিহ্নিত করতে পারেনি— গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা। নোট বাতিলের কোনও সুফলই পেল না ‘ধনী’ সাধারণ মানুষেরা। পেল ‘গরিব’ কালো টাকার কারবারিরা। তারা তাদের সমস্ত কালো টাকাকে সাদা করে ফেলল। উপরন্তু, বাজেটে আড়াইশো কোটি টাকা পর্যন্ত কারবারি কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে করছাড় দেওয়ার ঘোষণা করল সরকার। আগে তাদের দিতে হত ৩০ শতাংশ কর, ‘গরিব পুঁজিপতিদের’ দুঃখে সরকার কমিয়ে করল ২৫ শতাংশ।

কালো টাকা সাদা করার সাম্প্রতিক উদাহরণ গুজরাটের হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদি। আম্বানির জামাই বিজেপি ঘনিষ্ঠ এই ব্যবসায়ী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকা লুঠ করে বিজেপি সাংসদ বিজয় মাল্যের মতো অনায়াসে বিদেশে গা ঢাকা দিয়েছেন পরিবার-পরিজন নিয়ে। এর আগে তিনি বিজেপি সরকারের নোট বাতিলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সোনা-রুপোর বাট কিনে সমস্ত কালো টাকাই সাদা করেছেন। এই সত্য কি অস্বীকার করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও বিজেপির অন্য নেতা-মন্ত্রীরা?

জিএসটি চালুও সাধারণ মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে নয়— এটাও অর্থমন্ত্রী বুঝলেন দেরিতে। বলেছেন, ‘জি এস টি চালু হওয়ায় আরও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।’ কিন্তু অনিশ্চয়তা কেন, সরকার সেই অনিশ্চয়তা দূর করতে কী ব্যবস্থা নিয়েছিল? এর কোনও উত্তর অর্থমন্ত্রীর কাছে নেই। জিএসটি চালু করতে গিয়ে ‘এক দেশ এক কর নীতি’র স্লোগান তুলেছিল বিজেপি সরকার। বলা হয়েছিল, সমস্ত মানুষ একটাই কর দেবে, আগের মতো তাদের নানা রকমের কর গুনতে হবে না। বাস্তবে কী হল? কয়েকদিন যেতে না যেতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে শুরু করলেন, জিএসটি একটি অত্যন্ত জটিল করব্যবস্থা। বহু ক্ষেত্রেই জিএসটি-র ফলে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চেপেছে মানুষের ঘাড়ে। এর মারাত্মক ফল ভুগতে হচ্ছে তাদেরই। অর্থনীতিবিদরা বলতে শুরু করেছেন, এ এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।

নোট বাতিল ও জিএসটি চালুর ফলে এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হবে, সাধারণ মানুষের দুর্দশা আরও বাড়বে, এটা কি সরকার ও তাদের মাইনে করা অর্থনীতির পণ্ডিতরা জানতেন না? জানতেন, কিন্তু খোলসা করেননি। এস ইউ সি আই (সি) তখনই বলেছিল, নোট বাতিলের দ্বারা কোনও কালো টাকা উদ্ধার হবে না, একজন কালো টাকার মালিকও গ্রেপ্তার হবে না। সরকার সত্যিই তা চাইলে এমনিতেই তা করতে পারত, তার জন্য নোট বাতিলের দরকার ছিল না।

শ্রেণিবিভক্ত এই বুর্জোয়া রাষ্ট্রে যে কোনও আর্থিক সংস্কারই বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থে হয়। সোজা কথায়, মালিক শ্রেণির সেবাদাস সরকার আর্থিক সংস্কারের মাধ্যমে মালিকদের স্বার্থই রক্ষা করে। কিন্তু তা তারা করে জনগণের স্বার্থরক্ষার ঢাক বাজিয়েই। দেশের কর্পোরেট পুঁজিপতিদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল জিএসটি চালুর। বিজেপিও সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় বসেছিল। ফলে নোট বাতিল ও জিএসটি চালুতে লাভ হয়েছে দেশের একচেটিয়া কর্পোরেট পুঁজিপতিদের। নোট বাতিলের জেরে গরিব-মধ্যবিত্তদের ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু ও জিএসটি চালুর ফলে করের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ছাড়া কিছুই হয়নি। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকে থাকবে, আর তা থেকে উদ্ভূত কালো টাকার দুর্নীতি ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যাবে এমন অসম্ভব কাণ্ড যে ঘটতে পারে না, তা বোঝার জন্য অর্থনীতির পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই। নোটবাতিল ও জিএসটি মোদি সরকারের কর্পোরেট স্বার্থরক্ষার কর্মসূচি এবং জনগণের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়, তা আজ দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার।

কার্ল মার্কসের মূল্যতত্ত্ব

তিনের পাতার পর

করে। আলোচনা সহজ করার জন্য এখানে আমরা কারখানা আইনের প্রসঙ্গ টি উত্থাপন করছি না। তা হলে ১২ ঘণ্টা কাজের পর আমরা নিচের সারণী অনুসারে দেখতে পাব —

এই ব্যাখ্যায় মুনাফার সম্ভাবনার রহস্য উন্মেচিত হল। টাকা পরিণত হল পুঁজিতে। নিয়োগ কর্তা ও শ্রমিকের মধ্যে এই সহজ সরল লেনদেন কেবল পুঁজির উৎস ব্যাখ্যা করে না, এই লেনদেনের ভিত্তিতে যে আমাদের সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে সেটিকেও প্রকট করে তোলে, যাকে মার্কস বলেছেন, পুঁজিবাদী উৎপাদন। মার্কসের গ্রন্থের এটাই হল মর্মবস্তু এবং বর্তমানে ইউরোপ মহাদেশের বিশেষত জার্মানি ও রাশিয়ার সমাজতন্ত্রীরা এই তত্ত্ব পরিষ্কার বোঝেন।

আমি এই ৩ শিলিংকে মুনাফা না বলে মুনাফার মার্জিন বলছি। পুঁজিপতির পকেটে এই যে টাকাটা গেল, মার্কস তাকে বলছেন, 'উদ্বৃত্ত মূল্য'। এর সবটাই মুনাফা নয়, কিন্তু নিয়োগ কর্তার মুনাফা এর মধ্যে রয়েছে। এটা তাকে অনেকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। যেমন সরকারকে কিছু দিতে হয় কর বাবদ, জমির মালিককে খাজনা, দোকানদার ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কিছু কিছু অংশ। এই বিভাজন কোন নিয়মে ঘটে সেটা 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের তৃতীয় বিভাগে (২য় খণ্ড) ব্যাখ্যা করা হবে। গ্রন্থকার তার পাণ্ডুলিপি রেখে গেছেন। জার্মান ভাষায় এই গ্রন্থ যথাসম্ভব দ্রুত প্রকাশ করা হবে।

এইভাবে সমাজের সমস্ত শ্রেণি, যারা প্রকৃত অর্থে এবং প্রত্যক্ষভাবে সম্পদ উৎপাদন করে না, রাজা-রানি থেকে শুরু করে সংগৃহীত পরিচালক ও কাঁচা সব্জির দোকান পর্যন্ত সমস্ত শ্রেণি, এই উদ্বৃত্ত মূল্যের থেকে নিজের অংশ নিয়ে বেঁচে থাকে। অন্যভাবে বলা যায় তারা উদ্বৃত্ত শ্রমের নিট উৎপাদনের উপরে নির্ভরশীল হয়ে জীবন ধারণ করে। সেই নিট উৎপাদন পুঁজিপতি আদায় করে নেয় তার শ্রমিকদের কাছ থেকে কিন্তু তার জন্য সে কোনও পয়সা খরচ করে না।

সরাসরি উৎপাদনকারী নয়— সমাজের এমন প্রতিটি মানুষের কাছে উদ্বৃত্ত-শ্রমের অংশ কোনও পার্লামেন্টারি আইনের দান হিসাবে কর রাজস্ব থেকে আসছে কিংবা অনুৎপাদনশীল কোনও কাজ থেকে আসছে, সেটা মোটেই বড় কথা নয়। প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীরা অর্থাৎ শ্রমিক কোনও পয়সা না পেয়ে যে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে তার মোট পরিমাণ থেকে যে তহবিল গড়ে ওঠে, তার থেকেই এইসব ভাগাভাগি হয়ে থাকে।

(এলিওনর মার্কস ঃ মহান দার্শনিক কার্ল মার্কসের কন্যা, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী, কার্ল মার্কসের বহু গুরুত্বপূর্ণ রচনার অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন তিনি। এই লেখার সাব হেডিং আমাদের)

সিরিয়া আক্রান্ত

একের পাতার পর

প্রবল, কিন্তু রাশিয়াকে রোখা গেল না।

বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে এটুকু বলাই যায় রুশ বোমারু বিমানের আক্রমণে ওই সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিগুলি বিপন্ন হল। আকাশে রুশ বিমান, মাটিতে সিরীয় সামরিক বাহিনী— এই সাঁড়াশি আক্রমণে সন্ত্রাসবাদীদের দখল থেকে সিরীয় শহর আলেপ্পোকে ছিনিয়ে নিল সিরিয়া সরকার। সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝল সিরিয়ায় তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বসেছে। ফলে নতুন কৌশল, নতুন ছক, মিথ্যাপ্রচারের নতুন হাতিয়ারের মরিয়া খোঁজ চালাচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদী চক্র। এই প্রেক্ষাপটেই সিরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে শিশুহত্যার অভিযোগকে বিচার করতে হবে।

সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসের কাছে পূর্ব ঘোউটা জেলা প্রায় ছয় বছর ধরে জয়েশ আল ইসলাম, আল নুসরা ইত্যাদি আইসিস এবং আল কায়দার সহযোগী বিদেশি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের দখলে। যারা মার্কিন সিআইএ, ব্রিটেনের এমআই-৬, ফ্রান্সের ডিজিএসই প্রভৃতি সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা এবং আরবের ধনকুবেরদের সমর্থন এবং অর্থে পুষ্ট। সম্প্রতি সিরিয়ার সরকারি বাহিনী এই এলাকায় আটকে থাকা মানুষকে উদ্ধারে নামে। তখনই পশ্চিমি সংবাদমাধ্যম মৃত শিশুদের ছবি দেখিয়ে প্রচার শুরু করে সিরিয়া সরকারের অত্যাচারের কাহিনী। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই প্রচার তুঙ্গে তোলা হয়েছে। স্বভাবতই মানুষ এইসব ছবি দেখে শিউরে উঠছে এবং এই হত্যার জন্য সিরিয়া সরকারকে দায়ী করছে। এই অবস্থায় আবার সিরিয়া সরকার কেমিক্যাল গ্যাস দিয়ে শিশুহত্যা করছে এই প্রচার তোলা হচ্ছে। এর আগেও কয়েকবার কেমিক্যাল গ্যাস ব্যবহারের অভিযোগ সাম্রাজ্যবাদীরা সিরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে তুলেছিল। কয়েকটি দেশের মিলিত আন্তর্জাতিক তদন্তে দেখা গিয়েছিল সিরিয়া সরকারের কেমিক্যাল গ্যাসের কোনও ভাণ্ডারই নেই। ফলে এখন হাস্যকরভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে, উত্তর কোরিয়া এই গ্যাস পাঠিয়েছে। কিন্তু এই মিথ্যাও টিকছে না। সিরিয়ার সরকারি বাহিনী পূর্ব ঘোউটার দখল নিতে চলেছে বুঝেই মার্কিন মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা শিশুদের এবং সাধারণ মানুষকে সামরিক বাহিনীর সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এই খুনে বাহিনী উদ্ধারকারী দল এবং অবরোধ থেকে মানুষকে বার করে নিয়ে যাওয়া বাসের উপর গুলি চালাচ্ছে। তাতে অনেকের দুঃখজনক মৃত্যু ঘটছে। দুই পক্ষের গুলিবৃষ্টির মধ্যে শিশুরাও প্রাণ হারাচ্ছে। কিন্তু তার জন্য দায়ী কি মার্কিন মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা নয়? এই সন্ত্রাসবাদী বাহিনীর একটি অংশের নাম পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমে দেওয়া হয়েছে 'হোয়াইট হেলমেট'। যারা ত্রাণের নামে শিশু এবং সাধারণ মানুষকে অবরোধের মধ্যে ধরে রাখার কাজটি করে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন রাবারস্ট্যাম্পে পরিণত রাষ্ট্রসংঘ কথিত ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতির অর্থ দাঁড়ায় কোণঠাসা আইসিস সন্ত্রাসবাদীদের বাঁচার পথ করে দেওয়া এবং তাদের হাতে জনসাধারণকে ছেড়ে দেওয়া। তাই সিরিয়া সরকার এবং রাশিয়ান বাহিনী উদ্ধারকারী বাসগুলি বেরিয়ে যাবার জন্য নির্দিষ্ট পাঁচ ঘণ্টা ছাড়া বাকি সময় আইসিস-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারা মানুষকে বাঁচাতে চাইছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় কি?

পশ্চিমী সংবাদমাধ্যম কিন্তু একবারও বলছে না কিছুদিন আগেও সন্ত্রাসবাদীদের কবলে থাকা আলেপ্পো থেকে আইসিস এবং আমেরিকা হটে যাবার পর সেখানকার জনজীবন অত্যন্ত শান্তিতে অতিবাহিত হচ্ছে। আলেপ্পোকে মুক্ত করার যুদ্ধের সময়েও মার্কিন শাসকরা কোণঠাসা আইসিসকে বাঁচাতে একই রকম যুদ্ধবিরতির বাহানা তুলেছিল। যা সিরিয়া সরকার মানেনি বলেই আলেপ্পো আজ মুক্ত। সিরিয়ান ফ্রি প্রেস নেটওয়ার্কের মতে এই মুহূর্তে সিরিয়ার ৮৫ শতাংশ এলাকা সরকারি বাহিনীর দখলে এবং সেখান থেকে মানুষের পালানো, শরণার্থীর ঢল নামার মতো ঘটনাও অনেক কমে গেছে। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে বিবিসি, সিএনএন, আল জাজিরার মতো টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে দেখানো পূর্ব-ঘোউটার তথাকথিত 'সরাসরি সম্প্রচারিত' ছবির অনেকগুলিই আলেপ্পো বা অন্য শহরে বহু আগে তোলা। এই প্রশ্নও উঠছে, ক্লোরিন গ্যাস আক্রমণ বলে যে ছবি দেখানো হচ্ছে, তা তুলছেন এই চ্যানেলগুলির যে ক্যামেরাম্যানরা তাঁদের কিছু হচ্ছে না কেন? তাঁরা কি আগে থেকে সব জেনে গ্যাস মুখোশ ইত্যাদি নিয়ে ওখানে উপস্থিত হয়েছিলেন?

মার্কিন বন্ধু দেশ কাতারের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হামাদ বিন-জাসিম বিন-জবের আল-থানি গত বছর অক্টোবরেই এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আমেরিকা এবং তার সহযোগীরা সিরিয়ায় সক্রিয় সন্ত্রাসবাদীদের হাতে অস্ত্র সরবরাহ করে চলেছে দীর্ঘদিন ধরেই। 'আমেরিকান হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকার সাংবাদিক স্টিভেন সাহিউনিয়ে দেখিয়েছেন, ২০১১ সালের মার্চে লিবিয়াতে হত্যালীলা চালানো খুনে বাহিনী সিরিয়ার ডেরা শহরে যে হামলা শুরু করেছিল তা জর্ডন থেকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ (দ্য ডে বিফোর ডেরা, আমেরিকান হেরাল্ড ট্রিবিউন, ১০ আগস্ট ২০১৬)। অথচ ২০০৯ সালের আগে বাসার আল আসাদের সঙ্গে মার্কিন-ব্রিটিশ শাসকদের এমন বিরোধ ছিল না। এমনকী ২০০২ সালে আসাদকে ব্রিটিশ সরকার সাম্মানিক নাইটহুড দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ২০০৯ সালের পর থেকে রাশিয়াকে ঘিরে ফেলা ও ইরানের উপর আক্রমণের জন্য সিরিয়ার মাটিতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বানাতে দিতে আসাদের আপত্তি এবং মধ্যপ্রাচ্যের সাথে ইউরোপের স্থলপথ ও জলপথের উপর সম্পূর্ণ মার্কিন নিয়ন্ত্রণ ও ইজরায়েলের প্রশ্নে আসাদের সাথে মার্কিন-ব্রিটিশ মতভেদের পর হঠাৎ করেই আসাদ 'রক্তলোভী দানব' হিসাবে মার্কিন-ব্রিটিশ প্রচারের লক্ষ্য হয়ে উঠেছেন।

মার্কিন বিদেশ সচিব রেক্স টিলারসন ১৭ জানুয়ারি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় এ বিষয়ে বলেছেন, তাঁদের এখনকার উদ্দেশ্য— প্রথমত, বাসার আল আসাদের সরকারকে উচ্ছেদ করতে উত্তর সিরিয়ায় স্থায়ী মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপন। দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাসবাদীদের দখল করা এলাকাগুলিতে মার্কিন মদতপুষ্ট বাহিনীর ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা। তৃতীয়ত, সিরিয়াকে ভাগ করে দখলিকৃত মার্কিন এলাকায় আরও বেশি অস্থিরতা সৃষ্টি করে সিরিয়াকে অতিষ্ঠ করা। যার সুযোগে সিরিয়াতে মার্কিন তাঁবেদার সরকার বসানো (ইউ এস পিস কাউন্সিল ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)।

সিরিয়া আক্রমণকারী নয়, আক্রান্ত। বিশ্বের শান্তিকামী জনসাধারণকে মনে রাখতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী প্রচারে বিভ্রান্ত হলে চরম ভুল হবে। যে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সিরিয়ার মানুষের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে হাজার হাজার মৃত্যুর জন্য দায়ী তারাই। প্রতিটি শিশুর মৃত্যু, অমূল্য প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ধ্বংসের জন্য কাঠগড়ায় তুলতে হবে তাদেরই।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসত অঞ্চলের পার্টিকর্মী কমরেড স্বপন মিত্র ২৪ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি বিদ্যুৎগ্রাহক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরই তাঁর বাসভবনে গিয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা তাঁর

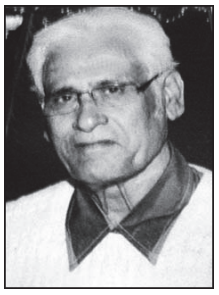

মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। কমরেড স্বপন মিত্র চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের মাধ্যমে দলের সাথে যুক্ত হন। দলের মুখপত্র ও বইপত্র তিনি নিয়মিত পড়তেন।

তিনি অ্যাবেকার বিভিন্ন কর্মসূচিতে সাধ্যমতো ভূমিকা পালন করতেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে দক্ষিণ বারাশত লোকাল কমিটির উদ্যোগে পার্টি অফিসে কমরেড স্বপন মিত্রের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড সমীর সান্তারার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় কমরেড স্বপন মিত্রের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, নীরবতা পালনের পর পার্টির জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুবীর দাস, কমরেড দিব্যেন্দু মুখার্জী প্রমুখ প্রয়াত কমরেডের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর গুণাবলিগুলি তুলে ধরেন।

কমরেড স্বপন মিত্র লাল সেলাম

পাঠকের মতামত

পেট্রোপণ্যের দাম

গণদাবী ৭০ বর্ষ ২৪ সংখ্যায় (২-৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮) 'সব রেকর্ড ছাপিয়ে যাচ্ছে পেট্রোপণ্যের দাম'-এ বলা হয়েছে ভারতকে তার জ্বালানির ৮০ শতাংশই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। তাই বিদেশে তেলের দাম বাড়লে ভারতে দাম বাড়বে বলে মানুষ মনে করে, সংবাদমাধ্যমগুলিও সেই ধারণা সৃষ্টি করে। কিন্তু কেন এত জ্বালানি আমদানি করতে হয় সে বিষয়ে কোনও আলোচনা ইদানীং হয় না। যতদূর মনে পড়ে কয়েক বছর আগে গণদাবীতে প্রকাশিত হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলেই আমাদের দেশের তেলের ক্ষেত্র ক্রমাগত আমদানি নির্ভর হয়ে পড়েছে। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকেও প্রয়োজনীয় তেলের ৭০ শতাংশ এ দেশেই উৎপন্ন হত। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি তা ছিল ২৫ শতাংশ। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২০ শতাংশ। এর কারণ ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে কেন্দ্রীয় সরকার লাভজনক শিল্প এবং তেল ক্ষেত্রগুলি দেশি-বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলির হাতে তুলে দিতে থাকে। এর ফলে ভারতের নিজস্ব তেল অনুসন্ধান ও তেল শোধন করার ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেওয়া হয়। তাই ভারতকে বেশি পরিমাণে তেল আমদানি করতে হচ্ছে। তাছাড়া পুঁজিপতিরা যাতে বেশি লাভ করতে পারে সেজন্য ভারতে উৎপন্ন তেলের দাম আমদানিকৃত তেলের দামের সমান করে রাখা হয়েছে। স্বভাবতই ভারতে উৎপাদিত তেলের দাম আমদানিকৃত তেলের অপেক্ষা কম হয়। সেই তেলও বেশি দামে বিক্রি করে অধিক মুনাফার সুযোগ করে দিয়েছে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার।

ডঃ প্রদীপ কুমার দত্ত
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ

ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন বিল
চিকিৎসক ও রোগীর স্বার্থবিরোধী

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় মেডিকেল কমিশন বিল-২০১৭ পার্লামেন্টে পেশ করেছে। দেশ জুড়ে চিকিৎসক সমাজ এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই বিল বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। কারণ, তাঁরা মনে করছেন এই বিল মেডিকেল শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিতকে ভেঙে দেবে। মেডিকেল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে করে তুলবে ব্যয়বহুল ও কর্পোরেট নির্ভর। প্রতিবাদের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার আপাতত বিলটি পার্লামেন্টারি স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছে। অর্থাৎ এই স্থায়ী কমিটির সুপারিশক্রমে যে কোনও সময়ে সামান্য পরিবর্তন বা পরিমার্জন সহ অথবা তা ছাড়াই বিলটি শীঘ্রই আইনে পরিণত হতে পারে। বিলটি হুবহু আইনে পরিণত হলে তা মেডিকেল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার ইত্যাদির উপর কী প্রভাব ফেলবে তা পর্যালোচনা হওয়া দরকার।

বিলটি যদিও মূলত মেডিকেল শিক্ষা সংক্রান্ত, তবুও তা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর সরাসরি মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। কারণ ডাক্তার যেখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছেন— সেখানে শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষার উদ্দেশ্য ইত্যাদি পাল্টালে যে ডাক্তার তৈরি হবে তাঁদের মানসিকতা, চিকিৎসার উদ্দেশ্য, রোগীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টাতে বাধ্য। তা ছাড়া মেডিকেল শিক্ষা তো কেবল শুধু একটি কলেজের উপর নির্ভর করে না, তার একটা বড় অংশ দাঁড়িয়ে আছে হাসপাতালের উপর। ফলে মেডিকেল শিক্ষার নীতিসমূহ পাল্টালে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হাসপাতালের পরিচালন ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার নীতিগুলিও একইরকমভাবে পাল্টাবে। ফলে এই বিল শুধু চিকিৎসক সমাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, তার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে সাধারণ মানুষের স্বার্থ। ভবিষ্যতে যাঁরা ডাক্তারি পড়বেন, সেই সব পরিবারের স্বার্থ তো জড়িয়ে রয়েছেই।

এ যাবৎ আমাদের দেশে মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত কিছুই— কোর্স-কারিকুলাম তৈরি থেকে শুরু করে কলেজের মানদণ্ড ঠিক করা, ডাক্তারদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিচার করা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বা এমসিআই। এমসিআই একটি স্বশাসিত সংস্থা এবং পার্লামেন্টের আইন বলেই তৈরি। যেখানে বেশিরভাগ প্রতিনিধিই নির্বাচিত হয়ে আসেন। এই কাউন্সিল-স্বীকৃত ডাক্তাররা শুধু এ দেশে নয়, আমেরিকা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া সহ বিশ্বের নানা দেশে কৃতিত্বের সাথে পেশাগত পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছে এবং রাখছে।

নতুন এই কমিশনে নির্বাচনের কোনও জায়গা নেই। কমিশনের ২৫ জন সদস্যের মধ্যে ২০ জনই হবেন কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে এই বডি মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করবে। অর্থাৎ একটি স্বশাসিত এবং নির্বাচিত বডির পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং মনোনীত ব্যুরোক্র্যাটদের দ্বারা পরিচালিত একটি বডির হাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। যা চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিকই নয়, দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। এবং যখন যে রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় থাকবে কমিশনকে সম্পূর্ণভাবে দলীয় স্বার্থে এবং বিশেষ কিছু ব্যবসায়ীর স্বার্থে ব্যবহার করার সমস্ত ক্ষমতাই সেই রাজনৈতিক দলের হাতে থাকবে।

উল্লেখ্য এমসিআই এর মতো একটি ৮৩ বছরের পুরনো নির্বাচিত সংস্থা, যা বিভিন্ন সময়ে স্বচ্ছ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কিছু কাজ করলেও বেশ কিছুকাল ধরে এর মাথায় উপবিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা নানা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। শীর্ষ আদালতের তত্ত্বাবধানে পূর্বতন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার দুর্নীতির দায়ে এমসিআই প্রধানকে চিহ্নিত করে, কিন্তু বিশেষ কিছু শাস্তির বিধান করেনি। আর বর্তমানের বিজেপি সরকার পরোক্ষে ওই এমসিআই প্রধানকে আরও উচ্চাসনে বসতে সাহায্য করে এবং তিনি এখন সারা বিশ্বের চিকিৎসক সংস্থার মাথায় গিয়ে বসেছেন। দেশে দুর্নীতি দমনের নানান আইন থাকা সত্ত্বেও কোনও কেন্দ্রীয় সরকারই এমসিআইয়ের কর্তাব্যক্তিদের দুর্নীতি ধরার কিংবা তার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কোনও চেষ্টা না করে কার্যত এই সব দুর্নীতি চলতে সহযোগিতাই করে আসছে। আর আজ সাধুপুরুষ সাজতে মোদিজি বলছেন, দুর্নীতিগ্রস্ত এমসিআইকেই ভেঙে দিলাম। অর্থাৎ মাথার চিকিৎসায় মাথাটিই কেটে বাদ দেওয়া।

গত তিন-চার দশক ধরে চিকিৎসা সংক্রান্ত গাফিলতি, অপচিকিৎসা, চিকিৎসা সংক্রান্ত মানুষের বঞ্চনা ইত্যাদির সুরাহা এম সি আই করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অভিযোগ পেয়েও জনস্বার্থে তার নিরসন করেনি। অথচ নয়া আর্থিক নীতির দ্বারা স্বাস্থ্যকে পণ্য করে তোলার ফলে মালিকদের অধিক মুনাফার স্বার্থ চরিতার্থ করতে বহু ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা মেডিকেল এথিক্স অমান্য করে তাদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছেন। ফলে জনমানসে এই সংস্থা সম্পর্কে বিশেষ কোনও শ্রদ্ধার জায়গাতো নেই-ই, উপরন্তু অনেকে এর কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ। ফলে এমসিআই-এর বডি নির্বাচিত নাকি স্বৈরতান্ত্রিক— সাধারণ মানুষ আজ এ সব নিয়ে হয়ত ভাবেন না।

কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কী হবে? মানুষ তো এর বাইরে থেকে বাঁচতে পারবে না! দুর্নীতি, জালিয়াতি এ দেশের আর কোথাও কি নেই? হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতি সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে। এ ছাড়া সরকারি কোষাগারের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা লুণ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের নানা দুর্নীতির সাথে পার্লামেন্ট থেকে পঞ্চায়েত পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই অসংখ্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যুক্ত। তা প্রমাণও হচ্ছে। তাই বলে কি মোদিজি পার্লামেন্টকে ভেঙে দেবেন! সুতরাং খোলা মনে ভেবে দেখা দরকার নির্বাচিত গণতান্ত্রিক বডি, যেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানেরই বেশিরভাগ প্রতিনিধি রয়েছেন, সুবিচার বা কম দুর্নীতি মুক্ত কাজকর্মের পরিবেশ তাঁরা যদি দিতে না পারেন, তা কি স্বৈরতান্ত্রিক, মনোনীত এবং বেশিরভাগটাই চিকিৎসাবিদ্যায় অজ্ঞ ব্যুরোক্র্যাটদের দ্বারা দেওয়া সম্ভব হবে? ইতিহাস বলছে — গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের চেয়ে হাজার গুণ দুর্নীতির জন্ম দেয় স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসন। কারণ সেখানে প্রশাসনের কেন্দ্রিকতার সাথে দুর্নীতিও কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। বিশেষ জ্ঞানের অভাবে এবং সম্পূর্ণ মুনাফাভিত্তিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ ঘটানোরও প্রভূত সুযোগ তৈরি হয়। নানা রকম অবৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ প্রয়োগের ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায়ে পরিণত হয়। যার ফলে আমাদের দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ বিনা চিকিৎসায় এবং অপচিকিৎসার শিকার হতে বাধ্য।

জাতীয় মেডিকেল কমিশন বিল আইনে পরিণত হলে জনস্বাস্থ্য ও মেডিকেল শিক্ষাকে করে তুলবে অত্যন্ত নিম্নমানের কিন্তু ব্যয়বহুল। চিকিৎসা এবং মেডিকেল শিক্ষার অধিকার এ দেশের সাধারণ নাগরিকরা হারাবেন। তা কিনতে হবে চড়া দামে।

ঢালাও মেডিকেল কলেজ খোলার সুযোগ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে মেডিকেল শিক্ষার মান এক ধাক্কায় তলানিতে এসে ঠেকবে। মেডিকেল কলেজ চালাতে গেলে সারা বিশ্বব্যাপী তার কী কী পরিকাঠামো এবং কোন যোগ্যতাসম্পন্ন কত লোক থাকবে তার একটা মাপকাঠি রয়েছে। আমাদের দেশেও সেটা রয়েছে। যদিও বিগত কয়েক বছর ধরে এম সি আই এই মানদণ্ডকে অনেকাংশে লঘু করে ফেলেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নির্ধারিত এই মানদণ্ড কোনও কলেজ না মানলে তার স্বীকৃতি বাতিল হয়ে যায়। নতুন নিয়মে এই মানদণ্ডের বালাই আর থাকবে না। যতটুকুও থাকবে তা যদি কোনও মেডিকেল কলেজ পূরণে ব্যর্থ হয় তা হলেও তাকে মেডিকেল কলেজ খোলার অনুমতি দেওয়া হবে। পরবর্তীকালে ঘাটতিগুলি পূরণে ব্যর্থ হলেও আর তার স্বীকৃতি বাতিল হবে না— কেবলমাত্র মোটা অঙ্কের ফাইন দিলেই হয়ে যাবে।

এ নিয়ম চালু মেডিকেল কলেজগুলির আসন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এই বিলে বলা হয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষই ঠিক করতে পারবে তার কতগুলি আসন থাকবে। অর্থাৎ বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর যে দশা হয়েছে মেডিকেল কলেজগুলির সেই দশায় পৌঁছানো শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। পরিণতিতে অত্যন্ত নিম্নমানের হাজার হাজার চিকিৎসক তৈরি করা হবে যাঁরা নামমাত্র পারিশ্রমিকে কর্পোরেট হাসপাতালের মামুলি কর্মচারীতে পরিণত হবেন। এর সাথে জনগণের পাশ করা চিকিৎসক বা চিকিৎসা পাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই।

এই বিল বলছে, এখন থেকে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ম্যানেজমেন্ট ৬০ শতাংশ আসনের ফি কত হবে তা ঠিক করবে। বাকি ৪০ শতাংশের উপরই মাত্র নিয়ন্ত্রণ থাকবে সরকারের। আরও বলা হয়েছে, মেডিকেল কলেজগুলির গুণমান কেমন তার জন্য একটি র‍্যাংকিং করা হবে। আর এই র‍্যাংকিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে বেসরকারি রেটিং সংস্থার হাতে। অর্থাৎ এখানেও কারসাজির সুযোগ থাকছে। টাকা দিয়ে কোনও কলেজ উচ্চ র‍্যাংক আদায় করতে পারলে বাজার অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী তার কলেজের ডাক্তারি আসন বিকোবে অনেক বেশি টাকায়।

ন্যাশনাল লাইসেন্সিয়েট পরীক্ষা বা এনএলই এবং নিট পরীক্ষা (ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট) বৃহৎ কোচিং সেন্টারগুলির মুনাফা বহুগুণ বাড়াবে, এই আইনের বলে এমবিবিএস-এর সাড়ে পাঁচ বছরের পাঠক্রম শেষে আবার একটি পরীক্ষা দিতে হবে এবং এমবিবিএস-এ ভর্তি হওয়ার জন্যও নিট পরীক্ষায় বসতে হবে। যাকে বলা হচ্ছে— গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষা এবং যে কোনও দেশের নাগরিকই এই পরীক্ষায় বসতে পারবেন। সম্পূর্ণ এমসিকিউ নির্ভর এই পরীক্ষা যেখানে প্র্যাক্টিক্যালের কোনও জায়গা নেই। কেবলমাত্র এই পরীক্ষাটায় পাশ করলেই শেষমেশ ডাক্তারি করার লাইসেন্স মিলবে বা এমডি অথবা এমএস পড়ার সুযোগ মিলবে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত চারটি প্রফেশনাল এমবিবিএস পরীক্ষা, থিয়োরি এবং প্র্যাক্টিক্যাল সবই রয়েছে তার কোনও মূল্যই থাকবে না। তেমনই, পৃথিবীর যে কোনও ছাত্র কেবলমাত্র এনএলই পরীক্ষায় পাশ করলেই এ দেশে ডাক্তারি করার সুযোগ পাবেন বা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবেন। সেখানে তার আদৌ কোনও প্র্যাক্টিক্যাল জ্ঞান আছে কি না তা বিবেচিত হবে না। আবার এই সব পরীক্ষা যেহেতু কোচিং সেন্টারকেন্দ্রিক, ফলে বড় বড় কোচিং সেন্টারগুলির পোয়াবারো হবে। ধনী ঘরের দুলালরা এখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালবে আর এমবিবিএস ডিগ্রি কিনে নেবে। কোথায় থাকবে চিকিৎসার মান? কোথায় থাকবে চিকিৎসার দায়বদ্ধতা? কোথায় থাকবে মেডিকেল এথিক্স? পাশ করার পরে বিনিয়োগ করার টাকা কতদিনে তুলতে পারবে সেটাই হবে অধিকাংশের একমাত্র লক্ষ্য। সরকারি চাকরিতে যোগ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই এখানে উঠছে না।

এই বিল আয়ুষ— (এওয়াইইউ এসএইচ) ডাক্তারদের ৬ মাসের ব্রিজ কোর্স করিয়ে আধুনিক চিকিৎসা করার অধিকার দেবে। আমাদের দেশে বাস্তব কারণেই বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির উৎপত্তি ঘটেছে। তার মধ্যে আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, ইউনানি, যোগা, সিদ্ধা-র মতো চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে। মানুষের প্রয়োজনে এইসব পদ্ধতিগুলি তার তার মতো ভূমিকা পালন করে চলেছে। যদিও সময়ের সাথে সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিজ্ঞাননির্ভর পদ্ধতির যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং পৃথিবী জুড়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারগুলি যেভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, তার বাস্তবোচিত প্রয়োগ সমাজ-সভ্যতার পক্ষে অপরিহার্য। সেখানে বহু চিকিৎসা ধারা যুগ যুগ ধরে একই জায়গায় রয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি পদ্ধতিরই যথেষ্ট উন্নয়নের সুযোগ ছিল কিন্তু সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তা হয়ে ওঠেনি। উপযুক্ত বাজেট বরাদ্দ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্য দিয়ে তা করা দরকার ছিল। তা না করে বিলের মধ্য দিয়ে সরকার চটজলদি আধুনিক চিকিৎসকের ঘাটতির কথা বলে ৬ মাসের ব্রিজ কোর্স করিয়ে আয়ুষের ডাক্তারদের আধুনিক চিকিৎসা করার অধিকার দেওয়ার কথা বলছে। যা শুধু অনৈতিক নয়, অবৈজ্ঞানিক, অন্যান্য পদ্ধতিগুলির পক্ষে অবমাননাকর এবং জনস্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনকও বটে। তা ছাড়া আধুনিক চিকিৎসকদের ঘাটতির কারণও অন্য, যা সরকার আড়াল করছে।

সামগ্রিকভাবে জাতীয় মেডিকেল কমিশন বিল আইনে পরিণত হলে জনস্বাস্থ্য ও মেডিকেল শিক্ষাকে তা করে তুলবে অত্যন্ত নিম্নমানের কিন্তু ব্যয়বহুল। চিকিৎসা এবং মেডিকেল শিক্ষার অধিকার এ দেশের সাধারণ নাগরিকরা হারাবেন। তা কিনতে হবে চড়া দামে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কর্তব্য হিসাবে স্বাস্থ্যের দায় ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলে স্বাস্থ্য ও মেডিকেল শিক্ষাকে ব্যয়বহুল পণ্যে পরিণত করার লক্ষ্যে একের পর এক প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি (১৯৮৩), দ্বিতীয় জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি (২০০২), তৃতীয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি (২০১৭) ইত্যাদি গ্রহণ করেছে। মেডিকেল কমিশন বিলও তারই অঙ্গ। আজ কংগ্রেস বিরোধী পক্ষে বসে এর বিরুদ্ধে কথা বললেও এই বিলের সূত্রপাত তার সরকারের হাত ধরেই হয়েছে। তারই পরিপূরক এই বিল মোদি সরকার পাশ করানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এর বিরুদ্ধে ডাক্তার, মেডিকেল ছাত্র সহ সর্বস্তরের মানুষের প্রতিবাদ আন্দোলন জরুরি। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম ও সহযোগী সংগঠনগুলি ইতিমধ্যেই আন্দোলনে নেমেছে।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

মহান স্ট্যালিন স্মরণ

৫ মার্চ বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা স্ট্যালিন স্মরণ দিবসে দলের কেন্দ্রীয় অফিসে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। মাল্যদান করেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু সহ অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নানা স্থানে স্ট্যালিন স্মরণ

৫ মার্চ সারা রাজ্যে অসংখ্য স্থানে মহান স্ট্যালিন স্মরণ দিবস পালিত হয়। ছবিতে মাল্যদান, ব্যাজ পরিধান, আলোচনার মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়।
ছবি ঃ কলকাতার টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন (উপরে) এবং গড়িয়ায় এলাকার মানুষকে নিয়ে কর্মীরা স্মরণ অনুষ্ঠান উদযাপন করছেন।

শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের নতুন সভাপতি হলেন নাট্য ব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী

শিল্পী সাংস্কৃতিককর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক তরুণ সান্যালের জীবনাবসানের পর গত ২ মার্চ সংগঠনের একাদশ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে সেই পদে প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তীর নাম ঘোষণা হলে ভিড়ে ঠাসা কলকাতার আশুতোষ হল প্রবল করতালিতে ফেটে পড়ে।

বক্তব্য রাখছেন বিভাস চক্রবর্তী

অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে শ্রী চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়, পার্থসারথি সেনগুপ্ত, কবীর সুমন, পবিত্র গুপ্ত, মীরাতুন নাহার, নিরঞ্জন প্রধান, সুজাত ভদ্র, ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, তরুণ নস্কর, কামাল আহমেদ, অশোক সামন্ত, তরুণ মণ্ডল, অজয় চ্যাটার্জী, বিষ্ণু দাস, মঞ্চের যুগ্ম সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ও সান্টু গুপ্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয় এবং সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের উপর একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়।

গোয়ালপোখরে কলেজের দাবিতে আন্দোলন

উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর একটি অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া ব্লক। সিপিএম ফ্রন্ট সরকার এবং বর্তমান তৃণমূল সরকারের আমলে এই ব্লকে মানুষের জীবনযাত্রার মানের কোনও উন্নয়ন ঘটেনি। দরিদ্র-কৃষক-খেতমজুর, বিড়ি শ্রমিক, পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের মানুষের বসবাস এই ব্লকে। এস ইউ সি আই (সি) দলের লাগাতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কয়েকটি দাবি ছিনিয়ে নিতে পারলেও বহু দাবি অপূরিত। তাই গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল, গোয়াগাঁও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইনডোর চিকিৎসা, গরিব মানুষকে বিধবা, বার্ধক্য ও প্রতিবন্ধী ভাতা, সমস্ত গরিব মানুষকে ডিজিটাল রেশন কার্ড, গোয়াগাঁও ভায়া গোয়ালপোখর থেকে ইসলামপুর এবং গোয়ালপোখর থেকে গোয়াগাঁও ভায়া জেলা সদর রায়গঞ্জ পর্যন্ত সকাল সন্ধ্যা দুটি এনবিএসটিসি বাস, গোয়ালপোখরে একটি কলেজ স্থাপন সহ ১১ দফা দাবিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি গোয়ালপোখর বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেন এবং তা পূরণের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কমরেড দীনেশ সিংহ, কমরেড মহিসুদ্দিন এবং কমরেড নবীন সিংহ।

কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবীদের আন্দোলনের সমর্থনে এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২৭ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

"কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতির শূন্যপদে নিয়োগ এবং স্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদ পূরণের দাবিতে আইনজীবীদের সংগঠনগুলি গত ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে কর্মবিরতি পালন করে চলেছে। আমাদের দল আইনজীবীদের এই কর্মবিরতি আন্দোলনকে আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাচ্ছে।

বিচারপতির অভাবে কলকাতা হাইকোর্ট প্রায় অচল অবস্থায়। বছরের পর বছর অসংখ্য মামলা বিচারাধীন অবস্থায় পড়ে আছে, তার উপরে প্রতিদিনই নতুন নতুন মামলা জমছে। বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতির সংখ্যা যা থাকা উচিত তার মাত্র ৩০ শতাংশ আছে। সংখ্যাল্পতার কারণে অধিকাংশ বিচারপতিকেই একদিনে একাধিক মামলা শুনতে হয়। অসংখ্য মামলা দিনের পর দিন জমে থাকছে, সাধারণ মানুষের হয়রানি বাড়ছে। এই অবস্থার প্রতিকার চেয়ে আইনজীবী সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রীর সাথে দেখা করে গত ১২ ফেব্রুয়ারি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। এরপরও কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায় আইনজীবী সংগঠনগুলি কর্মবিরতির ডাক দেয়। প্রথম দফায় ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করার পরও কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী না হওয়ায় আইনজীবীরা ঐক্যবদ্ধভাবে ৫ মার্চ পর্যন্ত কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আমাদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারকে কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবীদের ন্যায়সংগত দাবি মেনে নিয়ে এই অচলাবস্থা দূর করতে অবিলম্বে বিচারপতি এবং স্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে হবে।"

মিড ডে মিল প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিতে কলকাতায় মিছিল

রাজ্যের হাজার হাজার মিড ডে মিল কর্মী তাদের উপর ঘটে চলা শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে ২৭ ফেব্রুয়ারি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হন। কেন্দ্রীয় সরকারের এবারের বাজেটে এক টাকাও বরাদ্দ বৃদ্ধি না করার প্রতিবাদে এবং ১৩ দফা দাবিতে তাঁরা সোচ্চার হন।

তাঁরা দাবি তোলেন মিড-ডে মিল প্রকল্পকে এনজিও-র হাতে তুলে দেওয়া চলবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের কালা বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। রানি রাসমণি অ্যাভিনিউর বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক দাস। সমাবেশের মূল বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহসভাপতি সনাতন দাস, রাজ্য সম্পাদিকা চপলা বর, সহ সভাপতি সুশীল মিস্ত্রী, উত্তর ২৪ পরগণার বেলা পাল, মালদার তসলিমা বিবি, পশ্চিম মেদিনীপুরের কবিতা বেরা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। গৌতম দাস, শংকর বর ও অঞ্জলি মাইতির নেতৃত্বে যথাক্রমে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং শ্রমমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com